International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-I, July 2015, Page No. 64-70
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

(১৩ই মার্চ,১৯১৫ – ১৩ই অক্টোবর, ২০০৬)

প্রতিভা বসুর উপন্যাসে নারীর বন্ধনমুক্তি ও নারীর ক্ষমতায়ন

পারমিতা মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ভারত

Abstract

The journey of Bengali Novel started form Bankimchandra Chatterjee's 'Durgeshnandini' (1865). But the social status of women was either neglected or highly idealized by the authors upto the mid-twentieth-century. From the mid-twentieth-century some novelist (so called 'Lady-novelist') started to depict the real social status of women. Among them Pratibha Basu (13th March 1915-13th October 2006) took a great role to focus the suppressed condition of women by various kinds of superstitions and social barriers. She also highlighted the ways to get a open space for the women. She stressed on women's emancipation by women's empowerment in her novels: 'Manolina' (1944), 'Setubandho' (1947), 'Moner Moyur' (1952), 'Bibahita Stri' (1954), 'Megher Pore Megh' (1958), 'Modhyorater Tara' (1958), 'Bone Jodi Futlo Kusum' (1961), 'Ghumer Pakhira' (1965), 'Isworer Probesh' (1978), 'Prothom Bosonto' (1999) etc. So in her novels the heroines [as Anasuya ('Moner Moyur' 1952), Sujata ('Modhyorater Tara' 1958), Sita ('Padmasona Bharati' 1979), etc.] lead their life avoiding any understanding with freedom and prestige. They gave up many common easy opportunities to be self-dependant and self-guided. In this regard, in her birth-centenary we want to review her novels in the context of women's emancipation and empowerment.

Key Words: Women, Emancipation, Empowerment, Novel, Prativa Basu.

॥ ১ ॥

"অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?"[১] অনেকেই জীবনের প্রতিটি বিক্ষুব্ধ মুহূর্তকে এড়িয়ে যেতে চান। উপভোগ করতে চান শান্ত, নিরাপদ, সুস্থিত আশ্রয়ের পরিবেশ। কিন্তু পারেন কি? ক্ষয় পেতে পেতে পায়ের তলার মাটি যে আলগা হয়ে পড়ে। তখন স্থান খুঁজতে হয়, স্থান করে নিতে হয়। নইলে যে অস্তিত্বের সংগ্রামে হারিয়ে যেতে হবে। সেই অস্তিত্বের সংগ্রাম খুব যে সহজ ব্যাপার নয় একথা অতি মূর্খেও জানে। কিন্তু বিপদপ্রাজ্ঞ হোক বা না হোক বিপদগ্রস্ত মানুষকে বিপদ থেকে

উদ্ধারের পথ সব সময় খুঁজে বের করতেই হয়। সেই পথের অন্বেষণে হাতছানি আসে হঠকারিতার, হাতছানি আসে সহজে বাজি মাত করার প্রলোভনের, হাতছানি আসে অসত্যের সাময়িক দ্রুতির। এই সমস্ত প্রলোভনকে এড়িয়ে যারা সত্যের পথে, প্রেমের পথে, প্রকৃত মূল্যবোধের পথে চালিত হতে পারে তাদের জীবনে আসে শান্তি, আসে স্বস্তি, ঈশ্বরের স্পর্শ।

একশো বছর হতে চলল। এমন এক প্রতিভা জন্ম নিয়েছিলেন যার কলমের স্পর্শে মানুষের মনের গহনে জমে থাকা প্রেম ও অপ্রেমের নানা টানাপোড়েনের জগত উন্মোচিত হয়েছে। উন্মোচিত হয়েছে সত্যসন্ধ মানুষের অটল বিশ্বাসের জগত। সমাজ ও সংসারের চাপে, ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে অনেক অঘটন ঘটে, কিন্তু সেই সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে মুক্তির আলোকোজ্জ্বল পথের সন্ধান মেলে সেই কালোত্তীর্ণ কথাসাহিত্যিক প্রতিভা বসুর গল্পে, উপন্যাসে।

শতবর্ষের আলোকে আমরা বিচার করে দেখতে চাইব তাঁর উপন্যাস আজও কতখানি প্রাসঙ্গিক। কোন নির্দিষ্ট করে দেওয়া, স্ট্যাম্প মারা মতবাদের আবেষ্টনে আবদ্ধ থেকে নয় কীভাবে তিনি মানবিক সত্যকে অন্বেষণ করেছেন প্রকৃত দরদী মানসিকতা নিয়ে, নিরপেক্ষ বিচারবোধ ও যুক্তি দিয়ে। মহিলা লেখক মানেই মহিলাদের কথা বেশি করে বলবেন, 'নারীবাদী' মানসিকতায় আক্রমণ করবেন পুরুষ তথা পুরুষশাসিত সমাজের প্রতিটি বিষয়কে, ঘটনাকে - এরকম প্রত্যাশা আজকাল অনেকসময়ই দেখা যায় - যা খুবই বিপজ্জনক পরিস্থিতির জন্ম দিতে পারে। তাই, আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে প্রকৃত মানবতাবাদের কথা প্রতিভা বসু কীভাবে বলেছেন, কীভাবে প্রকৃত প্রেমের তথা ঐশ্বরিক আবেশের সন্ধান করেছেন তার স্বরূপ তুলে ধরা। একইসঙ্গে নারীর মানোন্নয়ন ছাড়া যে সমাজ ও সভ্যতা এগোতে পারে না, নারীর বন্দীদশা ও নারীর প্রতি অত্যাচার কীভাবে সমাজ-সভ্যতাকে পঙ্গু করে দিচ্ছে সেইদিকটি কীভাবে তিনি প্রস্ফুটিত করেছেন সেই দিকেও আমাদের নজর থাকবে।

।। ২ ।।

প্রতিভা বসু অবিভক্ত বাংলার (অধুনা বাংলাদেশের) ঢাকা শহরের অদূরে বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাবার নাম আশুতোষ সোম ও মায়ের নাম সরযূবালা সোম। কবি ও কথাসাহিত্যিক তথা বাংলা সাহিত্যের সব্যসাচী বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে বিবাহের আগে তিনি রাণু সোম নামে পরিচিত ছিলেন। প্রথম যৌবনে সংগীতশিল্পী হিসেবে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তিনি দিলীপকুমার রায়, কাজী নজরুল ইসলাম, হিমাংশু দত্ত ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে গান শেখেন। রাণু সোম নামে তাঁর একাধিক গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয়। ১২ বছর বয়সে প্রথম তিনি গ্রামাফোন ডিস্কে রেকর্ড করেন। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিনি সংগীতজগতে ছিলেন। বিবাহের পর তিনি গান ছেড়ে সাহিত্যের জগতে চলে আসেন।

প্রতিভা বসুর প্রথম ছোটোগল্প 'মাধবীর জন্য' প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালে এবং প্রথম উপন্যাস 'মনোলীনা' প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে। উপন্যাস, ছোটোগল্প, প্রবন্ধ ও শিশুপাঠ্য রচনা সহ তিনি শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি 'ছোটগল্প' ও 'বৈশাখী' নামে দুটি পত্রিকাও সম্পাদনা করতেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল :

উপন্যাস : 'মনোলীনা' (১৯৪৪), 'সেতুবন্ধ' (১৯৪৭), 'সুমিত্রার অপমৃত্যু', 'মনের ময়ূর' (১৯৫২), 'বিবাহিতা স্ত্রী' (১৯৫৪), 'মেঘের পরে মেঘ' (১৯৫৮), 'মধ্যরাতের তারা' (১৯৫৮), 'সমুদ্রহৃদয়' (১৯৫৯), 'বনে যদি ফুটল কুসুম' (১৯৬১), 'ঘুমের পাখিরা' (১৯৬৫), 'সমুদ্র পেরিয়ে' (১৯৭৫), 'ঈশ্বরের প্রবেশ' (১৯৭৮), 'পদ্মাসনা ভারতী' (১৯৭৯), 'মালতীদির উপাখ্যান' (১৯৯৭), 'প্রথম বসন্ত' (১৯৯৯) ইত্যাদি।

ছোটোগল্প : 'মাধবীর জন্য' (১৯৪২), 'বিচিত্র হৃদয়' (১৯৪৬), 'প্রতিভা বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প' ইত্যাদি।

প্রবন্ধ : 'মহাভারতের মহারণ্যে'।

।। ৩ ।।

আজ আমরা একবিংশ শতাব্দীর শূন্য দশকের মানুষ। কিন্তু এখনও চোখ-কান খোলা রাখলে আমরা প্রতিটি দিন উপলব্ধি করতে পারি মানবতার চরম অবক্ষয়িত চিত্র। প্রতিভা বসু তাঁর উপন্যাসে যেসব মানবিক সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন তার আবেদন আজও সমানভাবে রয়ে গেছে। আমরা বিশেষ কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করবো যেগুলি আজও সমাজে দগদগে ঘায়ের মতো বিরাজমান। এতদুদ্দেশ্যে আমরা আকরগ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করেছি প্রতিভা বসুর 'দশটি উপন্যাস'-কে।

১. স্বেচ্ছাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ সমস্যা : মেয়েরা আজকাল মোটেই পিছিয়ে নেই। বিদ্যালয়ে-মহাবিদ্যালয়ে-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরা সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে তো নয়ই দ্বিতীয়ার্ধেও মেয়েদের এমন সম্মানজনক অবস্থান ছিল না। প্রতিভা বসুর উপন্যাসেই আমরা তার পরিচয় পাই। 'ঈশ্বরের প্রবেশ' উপন্যাসে শুভলক্ষ্মীর মায়ের মুখে শোনা যায়- "মেয়েমানুষের বেশি লেখাপড়া শিখতে নেই।"[২] কারণ, তাহলে নাকি সে স্বামীকে মান্য করতে

পারে না। স্বামীকে হেলার চোখে দেখে। বি.এ. পাশ করার জন্য 'পদ্মাসনা ভারতী' উপন্যাসের নায়িকা সীতাকে রীতি মতো লড়াই করতে হয়। একেবারে প্রত্যন্ত গ্রাম ছাড়া মোটামুটিভাবে বর্তমানে বি.এ. পাশ করার জন্য মেয়েদের এতো লড়াই করতে হয় না। অবশ্য পড়াশোনা ছাড়িয়ে নাবালিকার বিয়ে দিয়ে দেওয়ার প্রবণতা যে এখনও সমাজে ক্রিয়াশীল তার প্রমাণ খবরে মাঝেমাঝেই আমরা দেখতে পাই, পুলিশ-প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়ে নাবালিকা যখন নিজের বিয়ে রুখে পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। কিন্তু, আগের চেয়ে অবস্থার সেই দিকে অনেক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু মেয়েদের স্বেচ্ছা বর নির্বাচন, বিশেষত তা যদি 'বে-জাতে' হয় তাহলে ধুন্ধুমার কাণ্ড বেঁধে যায়। প্রতিভা বসু সমকালের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন এখনও তা প্রায় একইরকম রয়ে গেছে।

'মনের ময়ূর' উপন্যাসে রুচিশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে অনসূয়া ভালোবাসে সম্পন্ন উচ্চশিক্ষিত পরিবারের ছেলে বিনয়কে। কিন্তু তাদের ঘর বাঁধার স্বপ্ন ভেঙে যায় জাতপাতের ধ্বজাধারী অনসূয়ার কাকা বিকাশ চৌধুরীর তৎপরতায়। তাঁর উন্নাসিক মনোভাব - "প্রেম করে কারা? দেহ বেচে যারা।"[৩] ফলত অনসূয়াকে আদালতে দাঁড়িয়ে বলতে হয় বিনয় তাকে জোর করে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেছিল। আদালতের বিচারে তার জেল হয়। অনসূয়ার পারিবারিক জীবনে নেমে আসে ঘোর বিপর্যয়। তাদের গ্রাম ছেড়ে বস্তিপ্রায় কলকাতার সংকীর্ণ গলিতে আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, দীর্ঘ ষোল বছর পর যখন সেই বিনয়-ই বিয়ে করে নিয়ে যায় অনসূয়াকে তখন বিকাশ চুপ করে সব মেনে নেয়। এই ক্ষেত্রে অনসূয়ার বাবা যে কতটা নিরুপায় ছিল তা লেখকের সহানুভূতিশীল মানসিকতায় বিধৃত হয়েছে -

> "সত্যিই তো, গ্রামে বাস ক'রে, সেই সময়ে সেই সমাজের আইন ভেঙে জাতিচ্যুত হওয়া কি সহজ কথা ছিলো? ছেলেমেয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রেমে আবদ্ধ হ'য়ে বিয়ে করবে, এটাই তো যথেষ্ট কেলেঙ্কারি – তার উপর অসবর্ণ বিবাহ?"[৪]

অনসূয়ার মা অবশ্য প্রতিবাদ করেছিলেন। মেয়ের সুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেছিলেন –

> "হোক কায়স্থ, জাত ধুয়ে কি আমি জল খাবো? আমার মেয়েই যদি সুখী না হলো তবে আমারই বা সুখ কী? তা ছাড়া কোনো মেয়ে যদি একজনকে ভালোই বাসে, তাকেই স্বামী হিসেবে দেখে, তা হ'লে কী ক'রে সে আরেকজন পুরুষের স্ত্রী হ'তে পারে? সে তো অসম্ভব। তার চাইতে বড়ো অধর্ম আর কী আছে স্ত্রীলোকের জীবনে?"[৫]

কিন্তু সমাজের নিষ্ঠুর বিধান, বিশেষত অন্ধ ধার্মিক, স্বার্থপর মানুষদের ষড়যন্ত্রে কীভাবে দুটি জীবনের ষোলোটি বছর ব্যর্থ হয়ে গেলো তা এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে। এরকম করে কত জীবন যে ব্যর্থ হয়ে যায় তা ভাবতে গেলে আমাদের হতাশ হতে হয়। সেই হতাশাও ঝরে পড়েছে লেখকের কণ্ঠে -

> "মূঢ় গুরুজন! অদম্য অধিকারবোধে কতো ক্ষতিই তোমরা করো সন্তানের। নিজেদের অহংকার পরিতৃপ্তির জন্য তোমরা তাদের বলি দিতেও দ্বিধাহীন।"[৬]

'পদ্মাসনা ভারতী' উপন্যাসেও স্বেচ্ছাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের সমস্যা ঘনীভূত হয়েছে। নায়িকা সীতার মুখে তাই আমরা শুনতে পাই -

> "নিজের বর নিজে পছন্দ করার মতো অসচ্চরিত্রতাই তো একটা মেয়ের পক্ষে ভয়ানক পাপ, তার উপরে অসবর্ণ বিবাহ?"[৭]

অবশ্য এই বিবাহ ঘটে এবং তার পরিণতি ভিন্ন কারণে ঋণাত্মক হয়ে পড়ে।

২. গর্ভস্থ ভ্রূণ-হত্যা ও সদ্যোজাত শিশু হত্যা বা ত্যাগ : আমরা খবরের কাগজে মাঝে মাঝেই দেখি ঝোপের মধ্যে সদ্যোজাত সন্তানের মৃতদেহ উদ্ধারের খবর। এর কারণ কী? কারণ একটাই - কামুক পুরুষের লাম্পট্য। তার চরম পরিণতি অবিবাহিত মেয়ের গর্ভসঞ্চার। পিতৃপরিচয়ের অভাবেই সদ্যোজাত শিশুর এইরকম করুণ পরিণতি ঘটে। 'মধ্যরাতের তারা' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় অনেকটা সেরকমই। পিতৃমাতৃহীন সুজাতা কাকার ঘরে কাটাচ্ছিল লাঞ্ছিত জীবন। তাকে দেখে মুগ্ধ হয় ডক্টর ব্যানার্জির ছেলে অমরেশ্বর। পিতৃবন্ধু বীরেশ্বরবাবুর মেয়ের সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলার আড়ালে সে আসলে সুজাতার কাছাকাছি আসতে চায়। বীরেশ্বরবাবুর ছেলের বিয়ের রাতে অঘটন ঘটে যায়। সুজাতার সম্মতি ছাড়াই একপ্রকার জোর করে অমরেশ্বর সুজাতার দেহসম্ভোগ করে। কিন্তু সম্ভোগের পর কৃতকর্মের লজ্জায় সে মুখ ঢাকার জায়গা খোঁজে। অবিবেচকের মতো সুজাতার কোন ব্যবস্থা না করে বিলেতে উচ্চতর শিক্ষার জন্য চলে যায়। কিছুদিন পর বীরেশ্বরবাবুকে চিঠি লিখে অর্থের বিনিময়ে সুজাতার দায়িত্বভার নিতে বলে। কিন্তু সুজাতার গর্ভলক্ষণ দেখা দিলে তাকে বাড়িছাড়া হতে হয়। সুজাতা বাধ্য হয়ে

আশ্রয় নেয় ডক্টর ব্যানার্জির ঘরে। সুজাতার প্রতি অমরেশ্বরের মায়ের একটা আলাদা স্নেহ ছিল। তিনি তাকে নিজের পুত্রবধূও করতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু যখন সুজাতার কাছ থেকে তার কুমারী অবস্থায় মাতৃত্বের কথা জানতে পারলেন তখন আর সামাল দিতে পারলেন না। স্বামীকে সুজাতার গর্ভস্থ ভ্রূণহত্যার ব্যবস্থা করতে বললেন। কিন্তু ডক্টর ব্যানার্জি কোনোমতেই একটা সম্ভাব্য জীবনকে নষ্ট করতে রাজী হলেন না।

> "অবিবাহিত ব'লে কি ওর মা হ'তে বারণ? চার-পাঁচ মাস ধরে যে ছোট্ট প্রাণটিকে ও লালন করছে আপন দেহের অভ্যন্তরে তার দাম কি কিছুই নেই?"[৮]

এমনকি এর জন্য যদি তাকে সমাজছাড়া হতে হয়, একঘরে হতে হয় তাতেও তিনি গ্রাহ্য করেন না। এব্যাপারে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে আক্ষেপেও তিনি ফেটে পড়েন -

> "বিনা অপরাধে বহু বহু বছর ধরে মেয়েদের উপর সমাজ এই অত্যাচারই চালিয়ে এসেছে, আর তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে মেয়েরাই সবচেয়ে বেশি।"[৯]

সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে সুজাতা মারা যায়। তার সন্তানকে নিয়ে ডক্টর ব্যানার্জির পরিবারে তুমুল অশান্তির সৃষ্টি হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অমরেশ্বর স্বীকার করে তার ভুলের কথা, সন্তানকে বুকে নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়।

'মালতীদির উপাখ্যান'-এ মালতীকে না বলে গোপনে মিত্যাচার করে মালতীর গর্ভপাত করানোর মতো জঘন্য নারকীয় কাজে লিপ্ত হতে দেখা যায় রমেনকে। উচ্চশিক্ষিত যুবক যে কীভাবে এরকম কাজ করতে পারে তা ভাবলে আমাদের গা শিউরে ওঠে।

৩. জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সমস্যা : বর্তমান কালে ভারতের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে অন্যতম হল জন্ম-নিয়ন্ত্রন-সমস্যা। যেভাবে ভারতে জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে তাতে সমস্যা বহুবিধ। সেই সমস্যা থেকে উত্তরণের একমাত্র রাস্তা জন্মনিয়ন্ত্রণ। সৌভাগ্যের কথা যে, সমাজের বেশিরভাগ মানুষই এখন এ ব্যাপারে সচেতন। কিন্তু সমাজের কিছু কিছু শ্রেণির মানুষ এখনও কিছু ভ্রান্ত নীতিতে বিশ্বাসী। তারা যে বিংশ শতাব্দীর সেইসব কুরুচিকর মানুষদের সার্থক উত্তরসূরি সেটি বোঝা যায় 'পদ্মাসনা ভারতী' পড়লে। বছর বছর বাচ্চা হওয়ার সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে সীতার এক কাকিমা অপারেশন করতে চাইলে স্বামীর কাছ থেকে তাকে জঘন্য কথা শুনতে হয় -

> "কাটিয়ে কুটিয়ে ফেলে দিলে বেশ্যাবৃত্তি করে এলেও কোনো বাপের ব্যাটা ধরতে পারবে না।"[১০]

এইরকম রুচিহীন অমানুষদের কবলে পড়ে অনেক মেয়ের জীবনে আজও দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসে।

৪. স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার-সমস্যা : ভারতের সংবিধান অনুযায়ী স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর সম্পূর্ণ অধিকার এখন স্বীকৃত। কিন্তু মধ্যযুগীয় মানসিকতার মানুষেরা আজও অনেকক্ষেত্রে সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না। সেই অমানবিক ঘটনার উল্লেখ আমরা পাই প্রতিভা বসুর 'বিবাহিতা স্ত্রী' ও 'ঈশ্বরের প্রবেশ' উপন্যাসে। 'বিবাহিতা স্ত্রী' উপন্যাসে রাজেনবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী হিরণ্ময়ীকে চরম হেনস্থা হতে হয় পুত্রবধূ প্রমীলার হাতে। বাবা যজ্ঞেশ্বরের কুপ্রস্তাবের দ্বারা চালিত হয়ে প্রমীলা শাশুড়ির সব গয়না চুরি করে অস্বীকার করে। এমনকি ঘর-সংসারকে এমনভাবে করায়ত্ত করতে চায় যাতে মনে হয় হিরণ্ময়ীর স্বামী মারা যাওয়ার পর তাঁর যেন আর কোন অধিকার ঘর-সংসারের উপর নেই। ফলে হিরণ্ময়ীর অন্য দুই ছেলের জীবন যেমন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে তেমনি সুনির্মল-এর জীবনেও নেমে আসে এক মরুময় দাম্পত্যজীবন।

'ঈশ্বরের প্রবেশ' উপন্যাসে স্বামী মারা যাওয়ার পর সুষমাদেবীর জীবনে এক ভয়াবহ দুর্যোগ ঘটে। নিজের পুত্র অবৈধ সম্পর্কের উষ্ণতা ভোগ করার জন্য মা-কে ধন-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত, বিতাড়িত করতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। অমানুষের মতো ঘোষণা করে -

> "পিতার অবর্তমানে পুত্রই সব। এটাই আইন।"[১১]

যদিও স্বামী যাবতীয় সম্পত্তি নিজের মেয়ে ও বৌমার নামে উইল করে গেছিল তবু পুত্রের জীবনের সুখের কথা ভেবে তিনি সবকিছু চুপ করে সহ্য করে যান। তাঁর মৃত্যুর পর শুভলক্ষ্মী সব জানতে পারে। কিন্তু জানোয়ার-সদৃশ প্রমথ-এর ঘর-সংসার করার ইচ্ছা তার চলে যায়। সে ঈশ্বরসদৃশ ডক্টর সান্যালের প্রেম বুকে নিয়ে ছেলেকে সঙ্গে করে সামান্য আত্মীয়তার সূত্র ধরে বিদেশের মাটিতে নিজের জীবনের আশ্রয় খুঁজে নেয়।

৫. দাম্পত্য সমস্যা : প্রতিভা বসুর উপন্যাসে অনেকাংশ জুড়ে আছে দাম্পত্য সমস্যা। এই সমস্যার মূল কারণ কী - এই প্রশ্নের অন্বেষণ যেমন তাঁর উপন্যাসে আছে তেমনি এই সমস্যা নিরসনের পথও নির্দেশিত হতে দেখা যায়। পুরুষশাসিত

সমাজে মেয়েদের অবস্থা কেমন, দাম্পত্য সমস্যার কারণ কী সেই সম্পর্কে 'পদ্মাসনা ভারতী' তথা সীতার ভাবনাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ -

> "পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েরা চিরদিনই অধীনস্থ। স্বামীরা মেয়েদের কাছে ভর্তা কর্তা প্রভু বিধাতা। সেই দেবতার জেদ মতলব ক্রোধ ফরমাস শাসন শাস্তি সবই ছিল স্ত্রীদের কাছে শিরোধার্য। এখন যেহেতু লেখাপড়া শিখে যতো মুষ্টিমেয়ই হোক, নিজেদের মেয়েরা আর ততো ছোটো ভাবতে পারছে না, গোলমালটা বেঁধে উঠছে সেইখানে। আমি বাদক তুমি যন্ত্র, আমি প্রভু তুমি দাসী, আমি ভোক্তা তুমি সেবিকা, এই বিধান আর মেনে নিতে পারছে না তারা। নারী নরকের দ্বার, এটা পুরুষের উক্তি, ঈশ্বরের নয়, এই সত্য তারা বুঝে ফেলেছে।"[১২]

যুগবদলের সঙ্গে সঙ্গে যে মেয়েরা জেগে উঠছে সেই চিত্র এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। একসময় সমাজের অবস্থা মেয়েদের পক্ষে খুবই অবমাননাকর ছিল -

> "সমাজের বিধানই এই যে কুষ্ঠরোগী স্বামী বেশ্যাবাড়ি যেতে চাইলে তাকেও কাঁধে ক'রে নিয়ে যেতে হবে। সেটাই স্ত্রীর কর্তব্য। স্ত্রীলোকের ঈশ্বর তার স্বামী। তার ইচ্ছা পালনই একমাত্র ধর্ম। সেখানে কেউ মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ালেই সে অসতী। আর অসতী মানেই গণিকার সমকক্ষ।"[১৩]

'মনোলীনা' উপন্যাসে প্রথম স্বামী সত্যশরণকে ছেড়ে এসে লীলাময়ী বুঝতে পারে তার জীবনে বড়ো ভুল হয়ে গেছে। দ্বিতীয় স্বামী তাকে মানুষের পর্যায়ে ফেলে না।

> "স্ত্রীকে তিনি একটা মূল্যবান সামগ্রী মনে করেন এবং সেটা পাঁচজনকে না দেখালে কি চলে? লীলাময়ীর কোন ইচ্ছাই সেখানে খাটে না।"[১৪]

সত্যশরণ লীলাময়ীকে বস্তুগত আর্থিক সুখ দিতে না পারলেও তার জীবনকে অমূল্য প্রেমে ভরিয়ে তুলেছিল। তাই জীবনের পৌঢ় বেলায় লীলাময়ী ফেলে আসা স্বামী ও সন্তানের জন্য হা-হুতাশ করে।

'সেতুবন্ধ' উপন্যাসে মেয়ের প্রেমকে সমূলে বিনষ্ট করে বিজয়বাবু মেয়ের বিয়ে দিতে চান বন্ধুপুত্র আই.সি.এস. অভিলাষের সঙ্গে। কিন্তু মেয়ে রিণি ভালোবাসে গুমটিওয়ালা শ্যামলকে। শ্যামলের সঙ্গেই সে শেষ পর্যন্ত সুখী দাম্পত্যজীবনের ঠিকানা খুঁজে নেয়। ক্রমশ জানা যায় অভিলাষ চরিত্রহীন বাবার চরিত্রহীন সন্তান। তখন অবশ্য রিণির মা নিজের সুখী প্রেমজীবনের সঙ্গে মেয়ের প্রেমজীবনের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে চরম পরিতোষ লাভ করেন। রিণির বাবাও ধীরে ধীরে সব মেনে নেন।

"বিয়ে করলেই যে মানুষ বিবাহিত হয় এ-ধারণা তাদের ভুল।"[১৫] এমনই উপলব্ধি ঘটে 'বিবাহিতা স্ত্রী' উপন্যাসের নায়ক সুনির্মল-এর। বিয়ের পর প্রমীলার সঙ্গে তার কখনই সুস্থ দাম্পত্য সম্পর্ক দানা বাঁধেনি। তার কারণ প্রমীলার দেহসর্বস্ব স্বার্থপর জীবনে প্রেমাকাঙ্খী সুনির্মলের কোন জায়গা ছিল না। সুনির্মল প্রেমের আশ্রয় খুঁজে পায় কুন্তীর মধ্যে। কিন্তু কুন্তী সমাজ-সংসারের খাতিরে শেষ পর্যন্ত সুনির্মলকে ছেড়ে পড়াশোনার জন্য বিলেতে পাড়ি দেয়। ফলত সুনির্মলের দাম্পত্য জীবন থেকে যায় প্রেমহীন এক যান্ত্রিক চলমানতার মধ্যে।

'পদ্মাসনা ভারতী' উপন্যাসের নায়িকা সীতা অনেক লড়াই করে নিজের প্রেমের মর্যাদা আদায় করে। কিন্তু দাম্পত্য জীবনে রজত আগাগোড়া বদলে যায়। হয়ে ওঠে সন্দেহপ্রবণ, মাতাল, চরিত্রহীন। বৌকে পেটাতেও সে কুণ্ঠিত হয় না। তাই প্রেমিক স্বামীর সংসার ছেড়ে সীতা হয়ে ওঠে পদ্মাসনা ভারতী। তার এই উত্তরণের পথে ক্রিয়াশীল থেকেছে পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের অসহায় অবস্থার বিরুদ্ধে এক সোচ্চার বিদ্রোহাত্মক মানসিকতা। তার কয়েকটি উক্তি এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য –

- "মা স্ত্রীলোক ব'লেই শাসিত জীব, বাবা পুরুষ ব'লেই শাসক।"[১৬]
- "সমান বয়সীদের মধ্যে সবই পারস্পরিক হওয়া উচিত।"[১৭]
- "তবু তাঁর (বাবা সম্পর্কে) বিবেচনায় মেয়েরা অন্ত্যজ পুরুষরাই মানুষ।"[১৮]
- "মেয়ে না-হ'লে কি মেয়ের দুঃখ কেউ এমন করে বোঝে? কোনো পুরুষ লেখকের সাধ্য নেই তাদের বেদনা এভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে।" [সবিতাদি সম্পর্কে][১৯]
- "চরিত্র, চরিত্র, চরিত্র, মেয়েদের চরিত্র নিয়ে উৎকণ্ঠা পুরুষদের আর এক ব্যাধি।"[২০]

- "স্বামী মানে প্রভু ঈশ্বর ভর্তা কর্তা সব। অবচেতন থেকে এই বোধই সকল পুরুষকে সমান মূঢ় ও দাম্ভিক করে তোলে।"[২১]
- "বস্তুত একজন মেয়ের পক্ষে একজন কামার্ত পুরুষ যতো ভয়াবহ ... এমন আর কোনো জীবজন্তু আছে তার সঙ্গে তুলনীয়?"[২২]

সংসারে মেয়েদের এই অসম্মানজনক অবস্থানের মূল কারণ সম্পর্কে খুব সহজেই সবিতাদি যে কথাটি বলেছেন তার মূল্যমানতা আজও বহমান -

"অকপট সত্যটা কি জানিস, মেয়েরা তো আর্থিকভাবে স্বাধীন নয়, সেখানেই তাদের আসল পরাজয়।"[২৩]

এই আর্থিক স্বাবলম্বন সীতা অর্জন করেছে। অর্জন করেছে 'ঈশ্বরের প্রবেশ' উপন্যাসের শুভলক্ষ্মী। 'সেতুবন্ধ' উপন্যাসের নায়িকা রিণিকেও আমরা স্বপ্ন দেখতে দেখি -

"তার চেয়ে এই বেশ - স্বাধীন হবো, মফস্বলে চাকরি নিয়ে দূরে থাকবো ..."[২৪]

মেয়েদের সঠিক পথের দিশা এইভাবে প্রতিভা বসু তাঁর উপন্যাসে দিয়েছেন। শুধু মেয়েদেরই নয় আসলে তিনি নির্দেশ করেছেন সুস্থ দাম্পত্যের সঠিক দিশা।

।। ৪ ।।

জীবনে চলার পথে কখনও কখনও ভাগ্যবিড়ম্বনা মানুষকে বিস্ময়বিমূঢ় করে তোলে। পড়াশোনায় যথেষ্ট মেধাবী, বিলেত ফেরত মালতীদির জীবনের কাহিনি পাঠের পর আমাদেরও হয়তো মনে হয় -

> "ভাগ্য। সবই ভাগ্য। এতোদিনে মনে হ'লো ভাগ্যের বিরুদ্ধে কিছুই করবার নেই মানুষের। ধর্ম মিথ্যা, সত্য মিথ্যা, বিবেক মিথ্যা, সব মিথ্যা। ভাগ্যই একমাত্র পরম সত্য। এতোকাল ধ'রে গল্পে-উপন্যাসে ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের যতো কাহিনী শুনেছি, কোনোটাই তার অসত্য নয়। ভাগ্য যাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, কেউ তাঁকে রক্ষা করতে পারে না।"[২৫]

কিন্তু ভাগ্যই কি শেষ কথা বলে? মালতীদির অনেক বেশি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হওয়া উচিত ছিল। প্রেম মানে একান্ত আত্মনিবেদন হলেও আত্মবিসর্জন নয়। একথা মালতীদি হয়তো জীবন দিয়ে শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু বড্ড বেশি দেরিতে। আত্মমর্যাদার সীমানা সঠিকভাবে অনেকেই উপলব্ধি করতে সমর্থ হন না। স্ত্রী বা পুরুষ যে-ই হোন না কেন তাঁকে যে ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হবে এই বার্তা যেন প্রতিভা বসুর উপন্যাসে পাওয়া যায়। নইলে মানবতার অপমান, সভ্যতার অবনমন হতে বাধ্য। আবার এব্যাপারটিও ভাবনার যে, কারও সহ্যক্ষমতাকে দুর্বলতা ভেবে যারা ব্যবহার করতে চায় তাদেরকে আমরা কোন নজরে দেখব? সচেতন মানুষ হিসেবে আমাদের দুর্বল মানুষদের পাশে যেমন দাঁড়ানো উচিত তেমনি সহ্যক্ষমতাসম্পন্ন মানুষদেরকেও সচেতন করে দেওয়া কর্তব্য সহ্য করারও একটা সীমা থাকা দরকার।

তথ্যসূত্র :

১. দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, দে'জ পাবলিশিং, মার্চ ২০০৫, চতুর্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১০২

২. বসু, প্রতিভা, দশটি উপন্যাস, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা - ৬২২

৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৪৩

৪. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৬৫

৫. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৬৫

৬. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৭২

৭. তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৯০

৮. তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৫৩

৯. তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৫৩

১০. তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৮৬

১১. তদেব, পৃষ্ঠা - ৬৪৮
১২. তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৭৯
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ৬৪৪
১৪. তদেব, পৃষ্ঠা - ১১
১৫. তদেব, পৃষ্ঠা - ২১৭
১৬. তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৮৭
১৭. তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৮৭
১৮. তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৮২
১৯. তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৬৯
২০. তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৮৭
২১. তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৯৩
২২. তদেব, পৃষ্ঠা - ৬০৩
২৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৮৭
২৪. তদেব, পৃষ্ঠা - ১০১
২৫. তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৬২

গ্রন্থঋণ :

১. বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০-১১, তৃতীয় সংস্করণ।
২. রায় দেবেশ, উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৬
৩. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০-২০১১, সপ্তম সংস্করণ।
৪. সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয়-পঞ্চম খণ্ড), ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, সপ্তম মুদ্রণ।

*****